সৌজন্যেঃ **স্বস্তিক ফার্মাসিউটিক্যাল**

পারিবারিক মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

অ্যাঞ্জেল

আপনার স্বাস্থ্য ও মননের সঙ্গী

ছোটদের শিক্ষনীয় মনোরঞ্জন অনুষ্ঠান

কলকাতা, মে সংখ্যা, ১লা মে , ২০১৯, ১৭ই বৈশাখ, ১৪২৬ বুধবার, একাদশতম বর্ষ ১ম সংখ্যা, ৪ পাতা, মূল্য ৪ টাকা

বাচ্চাটা বাইরে মিশতে পারে না... ৩-এর পাতায় ✸ বামুন পাড়ু ভ্রমণ -৪-এর পাতায় ✸ অ্যালার্জীতে হোমিওপ্যাথি -৭-এর পাতায়

মে দিবসের ইতিহাস

কর্মক্ষেত্রে এখনও প্রায়ই ছুটি ও ন্যায্য বেতনের দাবিতে গর্জে ওঠে কর্মীরা। সরকারি অফিস থেকে শুরু করে কলকারখানার কর্মীরা সবাই নিজের ন্যায্য পাওনার দাবিতে লড়াই করে। স্লোগান থেকে শুরু করে কর্মবিরোধিতার ডাক শোনা যায় প্রায়ই। তবে ন্যায্য পাওনা চেয়ে নেওয়ার দাবি শুরু হয়েছিল অনেক আগেই। সমাজতন্ত্র শুরু হচ্ছিল যখন, তখন দিনের পর দিন নিচুস্তরের মানুষ, যারা গরীব বলেই চিহ্নিত, তাদের দিনের সতেরো-আঠারো ঘন্টা বেকার খাটিয়ে প্রাপ্ত বেতন না দেওয়ার জুলুম চলছিল। কর্মচারীরা বুঝল, তারাই এই সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার মূল নায়ক। তাদের হাত দিয়েই তৈরী হওয়া জিনিসপত্র বেচে ধনী ব্যক্তিরা আরও ধনী হচ্ছে। সমাজের দরিদ্র পরিবারের পুরুষ-মহিলা- বাচ্চারা খাদ্যের অভাবে মারা যাচ্ছে। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে শুরু করে 'লেবার' বা 'ওয়ার্কাররা'। ১৮৮৬ সালের ১লা মে, বিশ্বব্যাপী তিনলক্ষ ওয়ার্কার (শিকাগো ৪০০০০) পথে নেমে কর্মবিরোধিতার ডাক দেয়। ৮ ঘন্টা কাজ এবং ন্যায্য বেতনের দাবিতে তারা কাজ বন্ধ করে দেয়। এইভাবে বিশ্বের সমস্ত জায়গাতেই বিক্ষিপ্তভাবে কর্মবিরোধীতার ডাক দেওয়া হয়। স্বভাবতই, পুঁজিবাদী সম্প্রদায় পুলিশ পাঠিয়ে এই প্রতিবাদ রুখতে চেষ্টা করে। ৪ঠা মে, লেবার ও ট্রেড ইউনিয়নের শান্তিপূর্ণ কর্মবিরোধিতার ডাকে কেউ বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়, বেশ কয়েকজন পুলিশ মারা গেলে সম্পূর্ণ দোষ যায় এই সাধারণ মানুষগুলোর ওপর। ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করে, তড়িঘড়ি ফাঁসি ও যাবজ্জীবনের সাজা শোনানো হয়। ৪জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়, ১জন আত্মঘাতী হয়। বাকিদের ফাঁসি রোধ করে আরও বেশ কিছু বছর মামলা চলে, তাতে বেকসুর খালাস হয় বাকিরা। এরপরই, বিশ্বব্যাপী আট ঘন্টা কাজ ও ন্যায্য বেতন দেওয়ার নিয়ম চালু হয়, সাথে মে মাসের ১ তারিখ 'ইন্টারন্যাশনাল লেবার-ডে' পালন করা হয়। বেশির ভাগ দেশেই এইদিন ছুটি থাকে, অনেক দেশ মে মাসের প্রথম সপ্তাহ জুড়ে এইদিনটি পালন করে।

কিন্তু বিশ্বের বাকি দেশ বাদ দিয়ে, শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই ভালো করে খোঁজ নিলে দেখা যায়, আট ঘন্টা তো অনেক দূরের কথা শিশুশ্রমও আইন করে বন্ধ করা অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে। মাসের প্রত্যেকদিন কাজ করবে বলে মহিলারা নিজেদের জরায়ু কেটে বাদ দিচ্ছে। বড়বড় অফিসে, বাইরের থেকে চাকচিক্য থাকলেও ভেতরে মানসিক ও শারীরিক হেনস্থা থেকে রক্ষা পাচ্ছে না কর্মচারীরা। আবারও সেই আগের মতোই অরাজকতা ও অনিয়ম শুরু করেছে পুঁজিবাদী সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ী মহল। তবে আজও 'মে-ডে' বা 'শ্রমিক দিবস' মনে করিয়ে দেয়, ন্যায্য পারিশ্রমিকের ও নির্দিষ্ট সময়ে কাজ করার দাবিতে গর্জে ওঠা শ্রমিকদের দৃষ্টান্তমূলক প্রতিবাদ।

পরীক্ষায় ভালো ফলের জন্য পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলারও প্রয়োজন

বাচ্চাদের সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার জন্য পড়াশুনোর পাশাপাশি খেলাধুলোর প্রয়োজনীয়তা অঙ্গাঙ্গীকভাবে জড়িত, সুস্থ ও স্বাভাবিক মস্তিষ্ক গঠনে খেলাধুলোর ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই সকল অভিভাবককে সচেতন হতে হবে, পড়াশুনোর পাশাপাশি খেলাধুলোর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে। কেউ কি বলতে পারে যে, আপনার সন্তানটি পড়াশুনোর পাশাপাশি খেলাধুলোয় দেশের একজন নামকরা ক্রীড়াবিদ হবে না! এই বিষয়ে জানালেন- **ডাঃ কেদার রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়**

ইংরেজিতে একটা কথা আছে - "All work and no play makes Jack a dull boy..."। আমাদের সকলের জীবনেই খেলাধুলোর গুরুত্ব অমূল্য এবং অনেক শারীরিক ও মানসিক সুস্বাস্থ্যের সুবিধাও রয়েছে। স্কুলে শিশুদের সামগ্রিক বিকাশের জন্য খেলাধুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং জীবনের সমস্ত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার জন্য তাদের প্রস্তুত করা হয়। সর্বোত্তম ব্যায়াম হল খেলাধুলো যা একটি ব্যক্তির সামগ্রিক ফিটনেস বজায় রাখতে সহায়তা করে। নিয়মিত ভাবে বিভিন্ন খেলাধুলোর সাথে যুক্ত থাকলে বিভিন্ন দীর্ঘস্থায়ী রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, শুধু তাই নয় রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়, তাছাড়া হাড় সুস্থ থাকে, হৃদপিন্ড, ফুসফুস ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। খেলাধুলোর মাধ্যমে ওজন, ডায়াবেটিস ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয় এবং রক্ত সঞ্চালনও উন্নত হয়। সুষম মানসিক ও শারীরিক বৃদ্ধির জন্য খেলাধুলো অপরিহার্য। ক্রমবর্ধমান শিশুদের জন্য, খেলাধুলো তাদের শরীরিক ও মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। খেলাধুলো বাচ্চাদেরকে একাডেমিক স্তরে উন্নিত করতে সাহায্য করে, মনোযোগী হতে সহায়তা করে এবং সতর্ক করে তোলে। ক্রীড়া সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনধারা পরিচালনার ক্ষেত্রে এবং মানুষের সুস্থতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। খেলাধুলো আমাদের চরিত্র গঠনে, নেতৃত্ব প্রদানে এবং লক্ষ্য স্থির করতে সাহায্য করে। হেরে গিয়েও হার না মেনে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করে, প্রতিকূলতাকে জয় করে সকল বাধাকে অতিক্রম করে জিততে শেখায়। এটি শিশুমনকে দায়িত্ববান, ধীরস্থির, নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস, পারস্পরিক বিশ্বাস বিকাশে সহায়তা করে। একজন ক্রীড়াবিদ সবসময়ই নিজের জীবনকে ইতিবাচক মনোভাব, নৈতিক মূল্যবোধ এবং সমাজের সকল মন্দতার থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে।

কিন্তু বর্তমান শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থার ভ্রুকুটিতে আজ হাতে গোনা খুব অল্প সংখ্যক বাবা-মায়েরাই আছেন যারা পড়াশোনার বাইরেও খেলাধুলোটাকে মূল্য দিয়ে থাকেন। অনেক বাবা-মায়েরাই তো আবার মনে করেন খেলাধুলো করা মানে সময় নষ্ট করা; তার চাইতে বরং সেই সময়ে বাচ্চারা যদি আরও ৪টে অঙ্ক বেশি করে তাহলে তারা লাভবান হবে। এই ধারণা নিতান্তই ভুল ধারণা। কোনো বাচ্চা যদি দিনের ২৪ ঘন্টার মধ্যে ১২ ঘন্টাই পড়াশোনা

করে তাহলে সে খুব শীঘ্রই মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়বে। এই ভাবে সর্বক্ষণ একটানা বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে থাকলে হয়তো পরীক্ষার ফলাফল ভালো হবে কিন্তু সেই ভালো ফলাফল কখনই দীর্ঘস্থায়ী বা চিরস্থায়ী হবে না। আর একবার যদি পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হতে শুরু করে তাহলে তা আর কোনো দিনও ভালো হবে না কারণ সে তার লড়াইয়ে হেরে গেছে; আর লড়াইয়ে হেরে গেলে কী করে আবার উঠে দাঁড়াতে হয় সেই শিক্ষা কখনওই কোনো পাঠ্যবই আপনার সন্তানকে শেখাতে পারবে না। তা পারবে কেবলই খেলার মাঠ। কারণ খেলার মাঠে খেলতে গিয়ে সে যতো বার হারবে বা যতো বার পড়বে, সে ঠিক ততটাই দৃঢ় ও লক্ষ্যের প্রতি স্থির হয়ে এগিয়ে যেতে পারবে। বাস্তবের সাথে লড়তে শিখবে আর কেউ তখন তাকে হারাতে পারবে না কিংবা কখনও যদি সে হেরে যায় তাহলে সে অন্তত মানসিক ভাবে ভেঙে না পড়ে পুনরায় আবারও উঠে দাঁড়াতে পারবে। খেলাধুলো কিন্তু সময়ের মূল্যবোধও শেখায়। ঠিক স্কুলে যেমন একটা নির্দিষ্ট সময়ে ঢুকতে হয় আর যখন ইচ্ছা বেরোনো যায় না, কেউ নিজের ইচ্ছা মতো সময়ে ঢুকতে পারে না, এক-একটা ক্লাস একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে চলে, ঠিক তেমনই বাড়িতেও আপনি আপনার সন্তানকে একটি রুটিনে চলতে অভ্যাস করান। এই রুটিনে যে কেবলই পড়াশোনা থাকবে তা একদমই নয় খেলাধুলোকেও প্রাধান্য দিতে হবে।

একটি বাচ্চাকে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনের পথে চলার জন্য একটি আদর্শ রুটিনের নমুনা দেখে নেওয়া যাক

যদি বাচ্চাটির স্কুল সকাল ৭টা থেকে ১০.৩০ হয় তাহলে তার রুটিন হওয়া উচিত

সকাল ৫.৩০ থেকে ৬ টার মধ্যে ঘুম থেকে উঠে ব্রাশ করে ফ্রেশ হয়ে স্কুলের জন্য খাতা-বই পেন-পেনসিল গুছিয়ে নিজে তৈরি হয়ে হালকা কিছু খেয়ে স্কুলের জন্য বেরিয়ে পড়তে হবে। তারপর স্কুল থেকে ফিরে স্নান-খাওয়া সেরে বিশ্রাম নিয়ে মাঠে গিয়ে খেলাধুলো করে ৫.৩০ বাড়ি ফিরে হালকা কিছু জলখাবার খেয়ে ঠিক ৬ টায় পড়তে বসতে হবে। টানা ১০টা অবধি পড়ে ১০.৩০-এর মধ্যে সেরে ফেলতে হবে রাতের খাবার। আর দেরি না করে ১১টার মধ্যে সোজা বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে হবে। খুব ভালো হয় যদি আগের দিন রাতেই পরের দিনের জন্য স্কুলের ব্যাগটা গুছিয়ে রাখার অভ্যাস করানো যায়।

আর যদি বাচ্চাটির স্কুল ১১টা থেকে ৪.৩০ হয়, সেক্ষেত্রে তার রুটিন হওয়া উচিত

সকাল ৫টা থেকে ৫.৩০-এর মধ্যে উঠে পড়তে হবে ঘুম থেকে। তারপর ব্রাশ করে ফ্রেশ হয়ে হালকা কিছু খেয়ে ৬টার মধ্যে পড়তে বসতে হবে। ৬টা থেকে ৯টা অবধি টানা পড়াশোনা করার পর স্কুলের জন্য ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে স্নান-খাওয়া সেরে নিয়ে তৈরি হতে হবে স্কুলের জন্য। তারপর স্কুল থেকে ফিরে ৬টা অবধি খেলাধুলো করে হালকা জলখাবার খেয়ে নিয়ে পড়তে বসতে হবে ৭টার মধ্যে। ৭টা থেকে ১১টা অবধি পড়ে ১১.৩০-এর মধ্যে রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়তে হবে।

উপরোক্ত দুই ধরনের নিয়মাবলী দেখে অনেক অভিভাবকেরই মনে হতে পারে দিনে প্রায় এক থেকে দুই ঘন্টা খেলাধুলো করলে সন্তানের পড়াশুনোর অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে, কিন্তু না বরং উল্টোটাই হবে, খেলাধুলো করলে আপনার সন্তান হয়ে উঠবে আরও বেশি মনোযোগী এবং পরীক্ষার ফলাফলও আগের থেকে ভালো হবে অনেকাংশে। অতএব সব সময়ে বাচ্চাদের বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে থাকতে বাধ্য করবেন না, তাদের খেলতে দিন, সবার সাথে মিশতে দিন, বেড়ে উঠতে দিন ওদের নিজেদের স্বাভাবিক ছন্দে। এতে তারা শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি মানসিক সুস্থতারও অধিকারী হয়ে উঠবে।

সাক্ষাৎকার- শ্যামল ঘোষ

অ্যাঞ্জেল

একাদশতম বর্ষ ১ম সংখ্যা, বুধবার ১৭ই বৈশাখ ১৪২৬, কলকাতা

অভিভাবকদের আচরণই শিশুর মূল্যবোধ গঠনে সহায়ক

সংসার-অফিস সামলেও শ্রাবণী সময় পেলেই সন্তানের পড়াশোনা থেকে শুরু করে ওর যাবতীয় বিষয়ের দিকে নজর রাখার চেষ্টা করে। তা সত্ত্বেও ইদানিং সে লক্ষ্য করছে সায়নের পড়ার প্রতি এতটুকু মনোযোগ নেই। দিনের পর দিন স্কুল থেকে তার সম্পর্কে কোনও না কোন অভিযোগ আসছেই। এমন সমস্যা শুধু শ্রাবণীর নয়। সমাজের বহু মায়েরাই নাজেহাল তাদের সন্তানদের নিয়ে। আবার দৃপ্তনীল তার পরিবার এবং স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে মাঝে মধ্যেই খুব খারাপ ব্যবহার করতে শুরু করেছে। তাই নিয়ে দৃপ্ত'র মা বিদিশার বড্ড চিন্তা। ছেলে যত বড়ো হচ্ছে, ততই তার মধ্যে মূল্যবোধের অভাব দেখা দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, সময়ের কাজ একেবারেই সময়ে করছে না। কিন্তু কেন? এরকম নানা সমস্যায় জর্জরিত অভিভাবকরা। এইসব বিষয়ে একটু ধৈর্য্যের সঙ্গে সন্তানদের বোঝার চেষ্টা করতে হবে, এমনটাই জানিয়েছেন বিভিন্ন বিশেষজ্ঞরা। এমন পরিস্থিতির মোকাবিলায় বাবা-মা কিংবা অন্যান্য অভিভাবকদের কী করণীয়।

ছোটরা তো নিয়মের ধার ধারে না। তবে একেবারে প্রথম থেকেই যদি কোনও বাচ্চাকে একটা সঠিক নিয়মের মধ্যে ফেলে দেওয়া যায়, তাহলে কিন্তু সে ওই ভাবেই বেড়ে উঠবে। প্রথমেই বাড়ির প্রতিটি অভিভাবকের আচরণে সংযম রাখতে হবে। কারণ, বাচ্চারা ছোট থেকে যা দেখে তাই রপ্ত করে নিজেদের মধ্যে। তাই বাড়ির বড়দের মধ্যে সংযম, সমানুভূতি, নিয়মানুবর্তিতা দেখলে, ছোটরা প্রথম থেকেই সেভাবে বড় হয়ে উঠবে। ছোট ছোট উদাহরণের মাধ্যমে ওকে বুঝিয়ে দিতে হবে, সময়ের কাজ সময়েই করতে হবে, না হলে আমাদের জীবন থেকে মূল্যবান অনেক জিনিস হারিয়ে যেতে পারে।

ছোট ছোট হাতে আপনার সন্তান যদি আপনার দৈনন্দিন কিছু কাজে সাহায্য করে থাকে, তাহলে ওর কাজের প্রশংসা করতে ভুলবেন না। ছোট থেকে যদি কোনও শিশুকে অতিরিক্ত শাসনের মধ্যে বড় হতে হয়, তাহলে তার মধ্যে মিথ্যে কথা বলার প্রবণতা যেমন বাড়ে, তেমনি তাদের মধ্যে উদ্ধত মনোভাব জন্মায়। তাই ছোটদের অতিরিক্ত মারধোর, বকাবকি এগুলো না করাই ভাল।

অনেকেই আছেন যাঁরা প্রতিদিনকার ব্যস্ত জীবনে সন্তানদের তেমন সময়ই দিতে পারেন না। এমনটা ভুলেও করবেন না। একটা নির্দিষ্ট সময় বের করে তার সঙ্গে কাটান। মন খুলে তার সঙ্গে সময় কাটান, খেলা করুন। এতে বড়দের সঙ্গে তার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক যেমন তৈরি হয়, তেমনি তারা অভিভাবকদের বাধ্য থাকে।

পড়ায় মনোযোগ

অভিভাবকদের প্রথমেই মাথায় রাখতে হবে, নিজের সন্তানের সঙ্গে আরেকটা বাচ্চার তুলনা করা ঠিক হবে না। বাচ্চাকে আদর করে পড়াতে হবে। প্রথম থেকেই দিনের নির্দিষ্ট একটা সময়ে পড়তে বসা অভ্যাস করতে হবে।

যে কোন রঙিন বিষয় ছোটদের বেশি আকর্ষণ করে। তাই পড়া বা নতুন কিছু শেখানোর ক্ষেত্রে যদি রঙের ব্যবহার করা যায়, তাহলে বোধ হয় ওদের শিখতে কোনও অসুবিধা হবে না। এক্ষেত্রে ছবি ও ব্লকের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। ইতিহাস, ভূগোল এইসব বিষয়গুলো পড়তে বসলে অনেক পড়ুয়াই সেভাবে উৎসাহ পায় না। সেক্ষেত্রে ভিজুয়াল কোনও দৃশ্য বেশ কাজে আসে। ওদের চোখের সামনে ইতিহাসের কিছু চিত্র তুলে ধরলে কিংবা সেই সময়কার কোনও তথ্যচিত্র ওদের দেখালে ইতিহাসের প্রতি ভাল লাগা বাড়তে পারে। ভূগোলের মতো বিষয় পড়ানোর সময় পাশে মানচিত্র নিয়ে কিংবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে সেইসব জায়গাগুলো সম্পর্কে আপনার সন্তানের মনে স্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলুন। এভাবেই এই বিষয়গুলো একটা সময়ে ওর ভাল লাগবে। অঙ্ক, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অনেক সময় অনেক সহজ কৌশল জানা থাকলে তা সহজ মনে হয়। সেইসব কৌশল এবং পড়ার ধরন ইন্টারনেটের মাধ্যমেও জেনে নিতে পারেন।

অনেক শিশু আছে, যারা একটানা পড়তে বসতে চায় না। এদের ক্ষেত্রে পড়ার মাঝে কিছুক্ষণের বিরতি দিলে দেখবেন, ওদের পড়ায় মন বসছে। তাই প্রথম থেকেই পড়ার প্রতি ভালবাসা তৈরি করাটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত অভিভাবকদের।

তাহাদের কথা

বড় স্বপ্ন পূরণের জন্য যেমন ছোট ছোট ইচ্ছাগুলোকে মরে যেতে হয়। ঠিক তেমনি উন্নয়ন এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতির জোরে হারিয়ে যেতে হচ্ছে পরিবেশের ছোট ছোট জীবগুলিকে। একটি সুস্থ বাস্তুতন্ত্রের প্রমাণ প্রজাপতি, জোঁক, এমনকি চড়ুই পাখিও। এবার ভালো করে ভেবে দেখুন তো, শেষ কবে চড়ুইয়ের কিচিরমিচিরের চোটে কান পাতা দায় হয়ে উঠেছিল। মনে পড়েছে না তো! এটাই এখন বাস্তবিক চিত্র। আস্তে আস্তে অবলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে চড়ুই পাখি। চড়ুই পাখি বিভিন্ন দেশে দেখতে পাওয়া যায়। মেয়ে পাখিদের গায়ের রঙ হালকা বাদামি এবং ধূসর রঙের হয়, আর ছেলে পাখিদের গায়ের রঙ গাঢ় ধূসর ও গাঢ় বাদামি হয়, তার মধ্যে কালো দাগ থাকে। চড়ুই লম্বায় প্রায় ১৬ সেমি মতো হয়, আর দেহের ওজন হয় প্রায় ২৪-৩৯ গ্রাম। এরা যেকোনো পরিবেশেই মানিয়ে নিতে পারে। এদের অভিযোজন ক্ষমতার জন্য এরা পক্ষী গোষ্ঠীর মধ্যে সেরা। ঘাসজমি থেকে মরুভূমি এরা সর্বত্রই মানিয়ে বেঁচে থাকতে পারে। পক্ষী গোষ্ঠীর মধ্যেই চড়ুই অনেক পুরোনো। এরা ফলের দানা, শস্য, পিঁপড়ে, ছোট পোকা সব কিছুই খায়। এরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে একসাথে থাকে। চড়ুইয়ের একটা বিশেষগুণ হল, এরা লোকালয়, মানুষের কাছাকাছি থাকতে খুব ভালোবাসে। তার মানেই এই নয় যে তারা পোষ মানে। লোকালয়ের থাকার জন্য একটা সুবিধা হল, তারা খাদ্য সংকটে কম পড়ে। তবে এদের সবচেয়ে বড় বিপদ হল শিকারি পাখিরা। চড়ুই পাখির দেহাকৃতি তুলনায় ছোট, তাই বিড়াল, পেঁচা ও বিভিন্ন বড় পাখির দল এবং অনেক ম্যামল প্রজাতির প্রাণীরা তাদের শিকার বানায়। এরা 'হাউস স্প্যারো' নামেও পরিচিত। ২০১২ সালে 'স্টেট বার্ড অব দিল্লি' বা দিল্লির রাষ্ট্রীয় পাখির আখ্যা পায় চড়ুই। এই আখ্যা দেওয়ার প্রধান কারণ হল, চড়ুইয়ের সাথে মানুষের আবেগপ্রবণ অনুভূতিগুলোকে সমাজের প্রত্যেকটা মানুষকে মনে করিয়ে দেওয়া।

পরিবেশবিদ্‌দের দাবি, হঠাৎ করে কোনও পরিকল্পনা ছাড়া গ্রামকে শহরে পরিণত করার জন্যই এই ঘটনাটা ঘটেছে। শহরের দূষিত বায়ু, থাকার জায়গার অভাব এবং মানুষের সংস্পর্শে থাকার অভাবের কারণেই তারা অভাবনীয় মাত্রায় কমতে শুরু করেছে। কয়েকবছর আগে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, খাদ্যের অভাবে রাস্তায় পড়ে থাকা মানুষের খাওয়া চুয়িংগামকে আটার গোলা ভেবে তা খেয়ে, গলায় আটকে হাজার হাজার চড়ুই পাখি মারা যাচ্ছে। এই সমীক্ষার পর মানুষের সচেতনতা বাড়াতে ক্যাম্পেন করা হয়। এছাড়া আরও একটি বড় সমস্যা, আগে বাড়িতে ধান, গম এগুলো রোদে দেওয়া হতে, সেখান থেকেই চাল, আটা তৈরী হত। কিন্তু এখন সব কিছুই প্যাকেটে ভর্তি হয়ে আসছে। ফলে তাদেরকে প্রবল খাদ্য সংকটে পড়তে হচ্ছে। এইভাবে বিলুপ্তির পথে তারা এগিয়ে যাচ্ছে। মানুষ চাইলেই নিজের সাধারণ বোধ ও চেতনাকে কাজে লাগিয়ে চড়ুইয়ের বিলুপ্তি আটকাতে পারে। নতুবা ভবিষ্যতে সুস্থ বাস্তুতন্ত্র আশা করা কঠিন হয়ে যাবে।

ছায়াছবির অন্তরালে

দর্শকের মন ছুঁয়ে নিতেই এমন কিছু সিনেমা তৈরী হয় যার গল্প দর্শকদের জীবন থেকেই নেওয়া। যেমন- ইউনাইটেড স্টেটসে বসবাসকারি হেলেন অ্যাডামস কিলারের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনার কিছুটা অংশ নিয়ে ২০০৫ সালে সঞ্জয়লীলা বনসালী তৈরী করেন জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত 'ব্ল্যাক' সিনেমা। সিনেমাটিতে রানী মুখার্জীকে অন্ধ এবং বধির মিচেল ম্যকনালির চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা গেছে। তারই শিক্ষক দেবরাজ সেহাই-এর চরিত্রে অভিনয় করেছেন অমিতাভ বচ্চন।

সিনেমাটির গল্পে দেখা যায়, অন্ধ ও বধির মিচেল অ্যালঝাইমারসে আক্রান্ত দেবরাজকে হাসপাতালে দেখতে এসেছেন। সেখানেই মিচেলের মনে পড়ছে পুরানো দিনের কথা। মিচেল মাত্র ২ বছর বয়সে অজনা এক রোগে আক্রান্ত হয়, তারপর সে সুস্থ হলেও তার চোখ ও কান কাজ করা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়। মিচেলের এই দুনিয়ার একমাত্র সঙ্গী ছিল নির্জনতা আর অন্ধকার। নির্জনতা আর অন্ধকারের জালে জড়িয়ে গিয়ে মিচেল এতটাই মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে যে, তাকে ঘরে রাখাও সমস্যা হয়ে পড়ে। মিচেলের বাড়ির লোক প্রতিনিয়ত এমন একজন শিক্ষককে খোঁজে যে, মিচেলকে এই নির্জন অন্ধকার থেকে মুক্তি দেবে। বয়স্ক মদকাসক্ত দেবরাজ মিচেলের দায়িত্ব নেয়। কিন্তু মিচেলের বাবা দেবরাজকে পছন্দ করেন না, তাকে চলে যেতে বলেন। কিন্তু মিচেলের মা দেবরাজকে ফিরিয়ে আনেন, তাকে একবার চেষ্টা করে দেখতে বলার জন্য। মিচেলের বাবা ব্যবসার কাজে ২০ দিনের মতো বাইরে থাকার দরুন দেবরাজ বেশ খানিকটা সময় পায় মিচেলকে ঠিক করার। তবে মিচেলের বাবা ফিরে এসে দেবরাজকে দেখে খুবই বিরক্ত হন এবং চলে যেতে বলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে দেবরাজ মিচেলের উপযুক্ত শিক্ষক হিসেবে প্রমাণ দেয়। মিচেল যখন নির্জনতা ছেড়ে বেরিয়ে আসছে ঠিক তখনই দেবরাজ অ্যালঝাইমারসে আক্রান্ত হয়। আর তখন মিচেল চেষ্টা করে দেবরাজকে কিছুটা সুস্থ করে। শেষে দেবরাজ যখন খুব অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি তখন মিচেল তাকে দেখতে হাসপাতালে যায় এবং সিনেমাটির গল্প চলতে থাকে।

সিনেমার শেষে দেখা যায় অন্ধ এবং বধির মিচেল অনেকটাই সুস্থ এবং সবার সাথেই নিজের মনের কথা বুঝিয়ে বলতে পারছে। সাধারণ মানুষের মতো সমাজে সবার সাথে আছে।

সিনেমাটিতে একটি মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিককে তুলে ধরা হয়েছে। ছোট ছোট জিনিস যা হয়তো আমাদের চোখ থাকার জন্য আলাদাভাবে উপলব্ধি করতে পারি না, সেই দিকগুলোকে তুলে ধরা হয়েছে। একজন মানুষ যখন শারীরিক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়, তখন সে, কতটা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে যেতে শুরু করে এবং তার সাথে থাকা কাছের মানুষগুলোর অবস্থা কতটা সঙ্গীন হয়ে যায়, তা এই সিনেমাটিতে খুব স্পষ্ট করে অভিনয়ের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। ছবিটি আন্তর্জাতিক স্তরের পুরস্কার পেয়েছে এবং বড় বড় ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সিনেমাটি দেখানো হয়েছে। সব থেকে বড় কথা সিনেমাটি দর্শকের মনে দাগ কেটেছে।

বেলের গুণাগুণ

ভারতের প্রায় সব কয়টি মন্দির সংলগ্ন অঞ্চলেই এই গাছটিকে দেখতে পাওয়া যায় কারণ হিন্দুরা এই গাছকে ভীষণই পবিত্র বলে মনে করে। শুধুমাত্র তাই নয়, এই গাছের ফল থেকে শুরু করে কাঠ, পাতা কিছুই বাদ যায় না, সবই পুজোর কাজে লাগে, বিশেষ করে বেল ফল ছাড়া শিব বা মহাদেবের পুজোই হয় না আর সব পুজোতেই বেলপাতা অপরিহার্য। এছাড়াও এই গাছের নানান ঔষধিগুণও আছে। আমরা একে বেল নামে চিনলেও সারা ভারত সহ শ্রীলঙ্কা, মালয়শিয়া এবং থাইল্যান্ডে এই বেলের আরও অনেক নাম আছে যেমন, উড আপেল, গোল্ডেন আপেল, বাংলার বাদাম, জাপানি বিটার অরেঞ্জ, স্টোন আপেল ইত্যাদি। তবে এর বিজ্ঞানসম্মত নাম - এলেল মরমেস। একটি মাঝারি আকারের বেলে প্রায় ৩১.৮ মিগ্রা কার্বোহাইড্রেট, ০.৩ মিগ্রা ফ্যাট, ১.৮ মিগ্রা প্রোটিন, ৫৫ মিগ্রা ভিটামিন-এ, ৬০ মিগ্রা ভিটামিন-সি, ৮৫ মিগ্রা ক্যালশিয়াম, ৬০০ মিগ্রা পটাশিয়াম, ২.৯ মিগ্রা ফাইবার, ১৩৭ কিলোক্যালোরি পাওয়া যায়। এখন এই ফলের কিছু বিশেষ গুণ সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক -

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ

প্রতিদিন সকালে এক গ্লাস বেলের সরবত ডায়াবেটিস প্রতিরোধের জন্য সত্যিই খুব উপকারি। বেলের মধ্যে রয়েছে ল্যাক্সটিভ যা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধ

দুই থেকে তিন মাসের জন্য আপনি যদি আপনার খাদ্যতালিকায় বেল ফল বা বেলের সরবত রাখেন তাহলে আপনি অতি সহজেই মুক্তি পেতে পারেন কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে। বেলের সরবতের স্বাদ কিছুমাত্রায় বাড়াতে যোগ করতে পারেন সামান্য নুন ও গোলমরিচ। তবে যাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে তাদের ক্ষেত্রে নুনটাকে এড়িয়ে চলাই ভালো।

হৃৎপিন্ডের সুস্থতা

বেলে উপস্থিত উপাদানগুলি আরও বেশি মাত্রায় পেতে হলে বেলের শাঁসটার সাথে সামান্য পরিমাণ ঘি মিশিয়ে যদি আপনি নিয়মিত খান, তবে আপনার হৃৎপিন্ড প্রায় ৫৪ শতাংশ রোগ মুক্ত হতে পারে।

গ্যাসট্রিক আলসার

বেলে রয়েছে এমন কিছু উপাদান যা আপনার খাদ্যতালিকায় যুক্ত করলে আপনাকে সাহায্য করবে গ্যাস্ট্রিক আলসার থেকে মুক্তি পেতে।

রক্তের বিশুদ্ধতা

প্রতিদিন সকালে সামান্য পরিমাণ উষ্ণ গরম জলের সাথে মধু ও বেল মিশিয়ে সরবত বানিয়ে খালি পেটে পান করলে রক্ত থেকে অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকারক টক্সিন দূর হয়। এতে করে আপনি পেতে পারেন উজ্জ্বল ত্বক ও বৃদ্ধি পাবে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাও।

কিডনির সুস্বাস্থ্য

নিয়মিত ভাবে বেল খেলে আপনার কিডনিও হতে পারে সুস্বাস্থ্যের অধিকারি।

কেন আমার বাচ্চাটা বাইরে মিশতে পারে না ?

ডঃ তন্ময় মিত্র, বিশিষ্ট সাইকোলজিস্ট

নিজেকে মেলে ধরাটা জীবনের প্রথমভাগে তত সহজ হয় না অনেকক্ষেত্রেই। এইজন্যই স্কুলের ক্লাসে বসে থাকা পঞ্চাশটা বাচ্চাই একরকম ভাবে মেলামেশা, আচার-আচরণ করে না। তাই কোনও বাচ্চা সর্বদাই কথা বলে (টকেটিভ), কোনও বাচ্চা চুপচাপ সঙ্কুচিত, কোনও বাচ্চা একা সারাক্ষণ, আবার আরেকজন সর্বদাই কারো না কারোর সাথে দলে রয়েছে।

আমরা যতই বড় হই আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেওয়ার পরিমাণটা বেড়েই চলেছে। শুধু নিজের বাড়ি নয়, কাজের জায়গা, রাস্তা-ঘাট, বাস-ট্রাম সব জায়গাতেই। প্রাপ্তবয়স্ক বা তার চেয়ে বয়স একটু বেশি হলে অ্যাডজাস্টমেন্ট করাটা কোনও বড় ব্যাপার হয় না। সমস্যা বেশি হলে সমাধানের পথ অনায়াসেই বেছে নেওয়া যায়। কিন্তু বদলাতে থাকা পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে সমস্যা হয় ছোটদের। তারা বুঝেই উঠতে পারে না কি করে সমস্যার সমাধান হবে।

একবার জেনে নিই কোন কোন ক্ষেত্রে শিশুদের মানিয়ে নিতে হয়

➢ প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে সেটা হল, পড়াশোনার চাপে শিশুদের খেলার সময় অ্যাডজাস্ট করতে হয়। বিকেলবেলা ফুটবল, ক্রিকেট বা কানামাছি খেলা তাদের আর হয় না। স্কুল থেকে ফিরেই টিউশন অথবা একটু বিশ্রাম নিয়েই আবার পড়তে বসা।

➢ যখন খুব চেনা মুখগুলোর থেকে অনেক দূরে চলে যেতে হয়, তখন বাচ্চাদের এই সমস্যাটা হয়। এটা বিশেষ করে দেখা যায়, যখন ক্লাস ফোরের পরে বা মাধ্যমিকের পরে অন্য স্কুলে চলে যেতে হয়। নতুন স্কুলে বেশিরভাগ সময়ই নতুন নতুন সব মুখ। সেখান থেকে নিজের প্রিয় বন্ধু বেছে নেওয়া বা কারুর বন্ধু হয়ে ওঠার মতো বিভিন্ন সমস্যায় তাদের পড়তে হয়।

➢ পড়াশোনার জন্য যখন নিজের বাড়ি, চেনা রাস্তা, শহর ছেড়ে অন্য জায়গায় যেতে হয়, সেই ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা হয়। এই সময় নিজের মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা প্রয়োগ না করলে বড় সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

➢ বাবা-মাকে কাজের সূত্রে যদি বাইরে বাইরে যেতে হয়, সাথে বাড়ির ছোট বাচ্চাটাকেও যদি বারবার করে স্কুল, বাড়ি বদলাতে হয় সেই ক্ষেত্রেও সমস্যা হতে পারে।

শিশুদের জীবনের সর্বপ্রথম মানিয়ে নেওয়ার বড় ঘটনা হল বাড়ির বাইরে প্রথম স্কুলে আসা। প্লে-স্কুল, কিন্ডার গার্টেন বা প্রেপ্ স্কুল যাই হোক না কেন! এই প্রথম শিশুটি পা রাখল অন্য গন্ডিতে অন্যদের কাছে, বাবা-মা, বাড়ির চেনা লোকগুলোর অনুপস্থিতিতে। এখানে তার কথা শোনার কেউ নেই। অপরিচিত পৃথিবী অপরিচিত ভয়। সেই থেকে একটি শিশুর মানিয়ে নেওয়া এবং মানিয়ে নেওয়া শুরু। নিজের বাড়িতে এটা ঘটে না এমন নয়। কিন্তু এই শিক্ষা শুরু হলেও এর প্রথম পরীক্ষা হল স্কুলের **গন্ডী**তেই হয়।

এমনই বড় পরিবর্তন ঘটে বাড়ি ছেড়ে যদি শিশু বা কিশোরকে যেতে হয় হোস্টেলে পড়াশোনার জন্য। পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার মানসিকতা তৈরী হতে থাকে এই নতুন জায়গায়। একটু বড় অবস্থায় বাড়ি ছেড়ে কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতেও এই রকম অ্যাডজাস্টের পালা চলতে থাকে।

এবার জেনে নেব কি ধরণের সমস্যা হয়

সময়ের সাথে মানিয়ে নেওয়া

ছোট থেকেই যদি বাচ্চারা বই মুখো হয়, তাদের মধ্যে বাহ্যিক জ্ঞানের বিকাশ খুব কম ঘটে। এই জন্য আমরা অনেক বাচ্চাদের দেখি যারা পড়াশোনায় খুব ভালো কিন্তু ঘরের বাইরে একা গিয়ে কোনও কাজ করতে পারে না, সাথে বাবা-মাকে প্রয়োজন হয়। এইসব ক্ষেত্রে প্রথমে বাচ্চাটাকে দেখে মনে হয় সে খুব ভালো, শান্ত-শিষ্ট তবে অনেক পরে বোঝা যায় সে মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত। আবার এই একই ক্ষেত্রে দেখা যায়, বাচ্চারা বাইরে গিয়ে খেলতে না পারার জন্য তারা রাত জেগে ফোনে বা কম্পিউটারে গেম খেলছে। ফোন নিয়ে নিলে খুবই অশান্তি করছে। বাবা-মা'র থেকে দূরে চলে যাচ্ছে।

চেনা মুখ থেকে অচেনা মানুষ

ছোট থেকে একসাথে বড় হওয়ার দরুণ বন্ধুদের মধ্যে একটা বিশ্বাসের সম্পর্ক তৈরী হয়। যখনই বাচ্চাটাকে একটা অন্য স্কুলে পাঠানো হয়, সে সেখানে গিয়ে প্রথম দিনেই সহজ হতে পারে না, তার সবার সাথে মিশতে সময় লাগে। কারণ সে নিজেকে সবার সামনে তুলে ধরতে পারে না, আর সহজেই বিশ্বাস করতে ভয় পায়। এই ক্ষেত্রে দুটি দিক দেখা যায়, প্রথমত হয় বাচ্চাটা তুলনায় খুব শান্ত হয়ে যায়, বেশি কথা বলে না, দ্বিতীয়ত নয় তো বাচ্চাটা নতুন আরও অনেক বন্ধু বানায়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সমস্যাটা পরে লক্ষ্য করা যায়। মাধ্যমিকের পরে স্কুল বদলানোর পর যেসব নতুন বন্ধু তৈরী হয়, বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তাদের সাথে সম্পর্কটা প্রায়ই থাকেই না। আর এইরকম সময় হওয়া বন্ধুত্বগুলোর মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার প্রবণতা দেখা যায়।

শহর বদলালে

পড়াশোনার জন্য অনেক ছেলে মেয়েরাই হোস্টেল বা বাড়ি ভাড়া নিয়ে বাইরে থেকে পড়াশোনা করে। এই ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাপ্তবয়স্ক সবে হচ্ছে বা হবে। এরা কেউই বাচ্চা নয়। কিন্তু এরা শহরের বাইরে পা রেখেই প্রথমেই বড়দের মতো চিন্তাভাবনা করতে পারে না। তাই নিজের জন্য কোনটা ঠিক আর কোনটা ঠিক নয় বিচার করতে সময় লাগে, ফলে নিজেকে সময় মতো নিয়ন্ত্রণ করতে না পারার জন্য অনেক বড় ভুল করে ফেলে। যেমন- বন্ধুদের দেখাদেখি নেশা করা, সমাজ বিরোধী কাজ করা ইত্যাদি। শুধু এইটাই নয়, যেসব বাচ্চারা ছোট থেকেই শান্ত আর নিজের চেনা পরিবেশে বড় হয়েছে তারা বাইরের পরিবেশ ও সেখানে থাকা মানুষগুলোর সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না। তাদের মতামতেরও দাম আছে সেটা বোঝার আগেই নিজেকে অনেক ছোট মনে করে। তাই অনেক ক্ষেত্রে এরা র‍্যাগিং-এর শিকার হয়। তারা র‍্যাগিং-এর মতো অন্যায়ের প্রতিবাদ না করে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালায়।

বারবার জায়গা বদলালে

বাবা-মায়ের কাজের সূত্রে বাচ্চাদেরও যখন বাড়ি ও স্কুল বদলাতে হয়, তখন বাচ্চাটার মানসিক চাপটা বেড়ে যায়। নিউক্লিয়ার পরিবারের সুবাদে বাবা-মা ছাড়া কাছের লোক বলতে স্কুলের বা পাড়ার বন্ধুরা, সেই ক্ষেত্রে বারবার বাড়ি ও স্কুল পরিবর্তন করলে তাদের কোনও ভালো বন্ধুও তৈরী হয় না। অবশ্য এইটার অভ্যাস হয়ে গেলে বড় বয়সে কোথাও একা থাকতে কোনও সমস্যা হয় না।

সমস্যার সমাধান

মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করাটা ভালো, কিন্তু এর সবচেয়ে বেশী খারাপ প্রভাব যেটা হয়, তা হল মানসিক সমস্যা। ছোটরাই এই সমস্যার সম্মুখীন সবচেয়ে বেশী হয়।

এই সমস্যাগুলি থেকে রক্ষা পেতে

➢ বাচ্চাদের সাথে বেশি করে কথা বলুন;

➢ বাচ্চাদের বাড়ির বাইরে বাকি বাচ্চাদের সাথে খেলতে দিন। যাতে তারা নিজের মতো করে একটু সময় কাটাতে পারে।

➢ বাচ্চারা যখন কিছু বলছে তাদের কথা গুরুত্ব দিয়ে শোনার চেষ্টা করুন, তাদের কাজের প্রশংসা করুন;

➢ বাচ্চারা বাড়ির বাইরে গেলে নিজেদের নিরাপত্তাহীনতার ভয় বাচ্চাদের ওপর চাপিয়ে দেবেন না;

➢ বাচ্চাদের বিশ্বাস করুন, আগেই বকাবকি করবেন না;

➢ পড়াশোনার জন্য বাড়ির বাইরে থাকলে তাকে বাড়িতে নিজেরা গিয়ে নিয়ে আসুন, তার সাথে একটু সময় কাটান।

বিশেষ সমস্যার ক্ষেত্রে

যেসব শিশুরা মানিয়ে নিতে গিয়ে মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত, তাদের মনোচিকিৎসকেরা পরীক্ষা করার সময় বিশেষ কিছু লক্ষণ দেখেন। আমাদের কাছে বহু শিশুর বাবা-মা এই সমস্যা নিয়ে আসেন। বাড়িতে হাসিখুশি, সব কিছুতে অংশ নেওয়া বাচ্চাটি স্কুলে গিয়ে একবারে চুপ, টিচারের কথায় উত্তর দেয় না। স্কুলের টিচারের নির্দেশমতো বোর্ডের থেকে লিখে আনে না। অন্য বাচ্চাদের সাথে কথাই বলে না, এড়িয়ে চলে। এসব ক্ষেত্রে মনোবিদরা অনেকসময়েই দেখেন, সমস্যা বেড়ে গেছে বাড়ির পরিবেশেই। শিশুটিকে শেখানো হয়নি বাইরে গেলে কিভাবে মিশতে হয়। অপরিচিত গন্ডির সমস্যা কাটানোর প্রাথমিক পাঠ বাচ্চাটি পায়নি। মনোবিদ তখন শুরু করেন সেই সামাজিকতার শিক্ষা। সেগুলি হল -

গ্রহণযোগ্যতা

শিশুটির কোনও বিষয় গ্রহণযোগ্যতা কতটা। সে কোন কোন বিষয়ের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছে।

প্রত্যাশা

কোনও বিষয় তার প্রত্যাশার পরিমাণ কতখানি। কোনও বিষয়ে প্রত্যাশা বেশি থাকা যেমন সমস্যার, ঠিক তেমনিই সব বিষয়ে আশাহীনতা বোধও ভালো নয়।

প্রশংসা

শিশুটি নিজের প্রশংসায় আনন্দ পাচ্ছে, সেটা যতটা দরকারি, ঠিক ততটাই জানা দরকার সে অন্যের কাজের কতটা প্রশংসা করছে।

বোঝা

শিশুটি পরিবেশের সাথে যখন মানিয়ে নিচ্ছে, তখন সাধারণ ঘটনা বোঝার ক্ষমতা তার হয়েছে। মনোচিকিৎসক তার সাথে কথা বলে বোঝেন, কোনও ঘটনার ঠিক-ভুল বোঝার ক্ষমতা তার কতটা।

এই মাপকাঠি ছাড়াও আরও কিছু পদ্ধতি থাকে। তাই শিশুটি মানিয়ে নিতে গিয়ে মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়েছে বুঝলে নির্দ্বিধায় মনোচিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

দূরে কোথাও

অচেনা সাগরবেলা বামুনপাড়ু

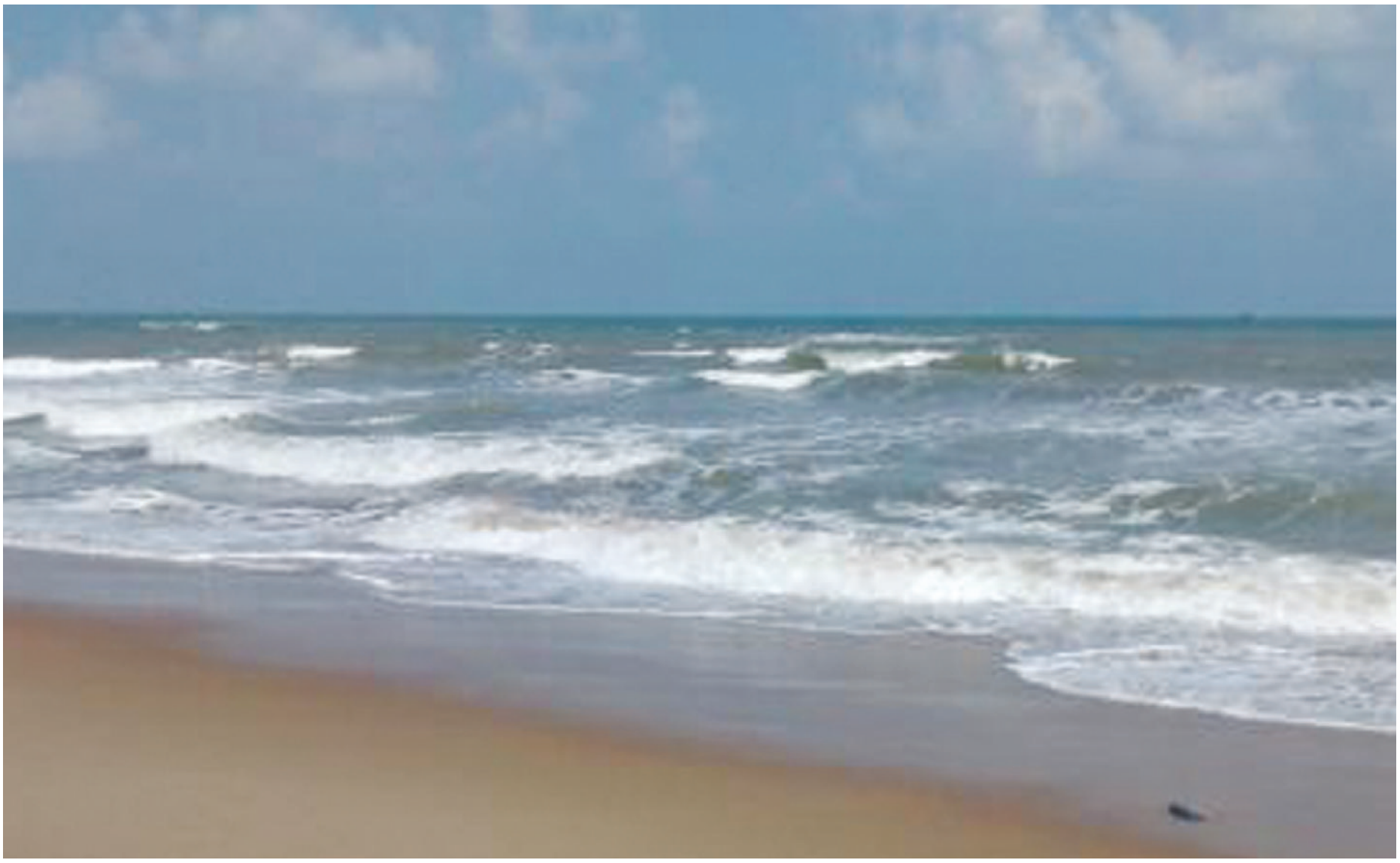

অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলাম জেলার নির্জন এক সাগরবেলা বামুনপাড়ু। একেবারে অচেনা অপরূপ এই সাগরবেলা।

কর্মক্লান্ত শরীরটা নিয়ে মাঝে মাঝে হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে কোনো অচিন দেশে। চেনাপথে আর যেতে ইচ্ছে করে না। হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে কোনো নির্জন গন্তব্যে। তা সে সাগর পারই হোক বা পাহাড়ী পরীর দেশই হোক। অথবা বনে জঙ্গলে। এবার পরিযায়ী মন নিয়ে পৌঁছে যাই অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলাম জেলার এক সাগরবেলা বামুনপাড়ুতে। মূলতঃ শ্রীকাকুলাম ভ্রমণের উদ্দেশ্য নিয়ে বাড়ি ছেড়ে ছিলাম, কিন্তু নেমে পড়লাম নৌপাড়া জংশনে। পাগল মন কি নিয়ম মেনে চলতে চায়?

হাওড়া-চেন্নাই মেল যখন আমাদের নৌপাড়া জংশনে নামিয়ে দিয়ে শ্রীকাকুলামের দিকে যাত্রা করল গাড়ি, কাঁটায় কাঁটায় তখন ঠিক বেলা ১১টা। নভেম্বরের শেষ, তবুও অর্কপ্রভের কি তেজ! কেন নৌপাড়া নেমে পড়লাম তার কোন সঠিক কারণ নেই। তবুও মনে হল এখানে কোন না কোন অচিন সাগর সৈকতের সন্ধান পাব। নৌপাড়ার টিকিট কালেক্টর জানালেন অচেনা সেই সাগরবেলার ঠিকানা। স্টেশন থেকে মাত্র ১৫ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত বামুনপাড়ু সেই ঠিকানা। অটোতে বামুনপাড়ু পৌঁছতে সময় লাগে কমবেশী আধঘন্টা। পেয়ে গেলাম একটি অটো। উপ্পু নৌপাড়া, আলতারা জংশন হয়ে রাস্তা গিয়েছে সাগরসৈকতে। আলতারা জংশন থেকে সোজা রাস্তা চলে গেছে পুন্ডীর দিকে তথা পলাশার দিকে। আমাদের অটো ডানদিকে ছুটে চলল। এখান থেকে সাগরবেলা কমবেশী ৪-৫ কিমি পথ, প্রখর রৌদ্রে চারিদিক ঝলমল করছে।

ওই দূরে দেখা যাচ্ছে পান্না সবুজ জলরেখা। তারপরেই নীলিমায় নীল। নীল আকাশের নিচে সোনালি বালুকাবেলা খেলা করছে। এই সেই অচিন সাগরবেলা বামুনপাড়ু। নাহ! এখানে নেই কোন উদ্ভিন্ন যৌবনা রমনীর স্বল্পবাস সমুদ্রে স্নানের দৃশ্য, নেই কোনোরকম ভিড়ভাট্টা। রয়েছে অনাবিল সৌন্দর্য, মন কেমন করা আবহ। নিজের প্রেমিকার সাথে দু-দন্ড প্রেম করার প্রতিশ্রুতি সর্বত্র। একাকীত্ব বামুনপাড়ু সৈকতের অহংকার তথা শ্রেষ্ট প্রাপ্তি হতে পারে। সোনালী বালুকা বেলায় বসে মাছ ধরার জাল বুনছে জেলের দল। বালিতে বিশ্রাম নিচ্ছে রঙ বেরং-এর ইচ্ছাতরী। ক্রমাগত ঢেউ আসছে ঢেউ যাচ্ছে, এমনটাই নিয়ম। কিন্তু সে আসা-যাওয়াকে দারুণভাবে উপভোগ করা যায় এখানে। দুটি বাতিঘর নজরে আসে, তবে কালের চক্রে আজ দুটিই পরিত্যক্ত।

বামুনপাড়ু সাগরবেলা এতই নির্জন যে, পাখির ডাক অবাধ কর্ণ কুহরে এসে প্রবেশ করে। পায়ে পায়ে এগিয়ে যাই। দামাল বঙ্গোপসাগর এখানে বেশ শান্ত। যেন ছলনাময়ী। দূরে তাকালে নজরে আসে আদিবাসী রমনীরা রৌদ্রতপ্ত রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে মাথায় বোঝা নিয়ে। শুনলাম, ওর মধ্যে নাকি শুঁটকি মাছ আছে। কেউ কেউ আবার জ্বালার মত কিছু একটা মাথায় নিয়ে চলেছে, ওতে আছে ছোট মাছ, ভিতরে জল। এগিয়ে চলি সামনের দিকে। দমকে দমকে সমুদ্রের নিজস্ব গন্ধ এসে পৌঁছয় নাকে। ওই দূরে নজরে আসে একফালি সবুজ। ভেবে পাই না বালুকা বেলায় এমন সবুজের ছোঁয়া এল কোথা থেকে? প্রকৃতির অকৃত্রিম উপহার। বামুনপাড়ু সাগরবেলা এলে মনে হবে একটা পরকীয়া প্রেম করি। উপভোগ করি সূর্যতাপ, চন্দ্রতাপ। কিন্তু বামুনপাড়ু এতই অচেনা সাগরবেলা যে, এখানে থাকবার কোনো ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। মন খানিকটা বিষন্ন হয়ে যায়। একটা কথা নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি, অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার এখানে বামুনপাড়ু সম্পর্কে কোনো খোঁজই পায়নি। তাহলে হয়তো পর্যটন বিকাশের চেষ্টা করতো। এই ভেবে আনন্দ পাই যে, ভাগ্যিস খোঁজ পায়নি! তাইতো বামুনপাড়ু আজও রয়ে গেছে নীরবে, নীল নির্জনে।

সামান্য এগিয়ে গিয়ে দেখে আসা যায় লবণ তৈরির পদ্ধতি। একটা ব্যাকওয়াটারের মত রয়েছে। সেখানে ভেসে বেড়ায় অসংখ্য নৌকা। অনেকটা আমাদের বকখালি-ফ্রেজারগঞ্জের মত। পথে যেতে নজরে আসে বস্তা বস্তা নুন। আমরা নৌপাড়া থেকে বামুনপাড়ু যাওয়ার পথেও লক্ষ্য করেছিলাম লবণ তৈরির প্রচুর জায়গা। তেলেগু ভাষায় উপ্পু শব্দের অর্থ বন বা নুন। এখানে এত লবণ উৎপন্ন হয় যে, একটা জায়গার নাম হয়েছে উপ্পু নৌপাড়া। যে ব্যাকওয়াটারের কথা বললাম, সেটা খুবই গভীর ও উত্তাল। তাতে যে, নৌকাগুলি ভাসছে সামনে উথালি-পাথালি খাচ্ছে। বেশ কিছু সময় কাটাই এখানে। এরপর ফিরে চলা সেই নৌপাড়ার দিকে। বামুনপাড়ু সাগরবেলা এবং তার নির্জনতা, অনুভূতিকে ঘন্টা দেড়েক ধরে চুটিয়ে উপভোগ করে ফিরে চললাম তথাকথিত সভ্যজগতের দিকে। নৌপাড়া পৌঁছে গেলাম অল্প সময়ের মধ্যে। ওই দূরে দেখা যাচ্ছে ট্রেন। মেইন লাইন ছেড়ে লুপ লাইনে উঠে নৌপাড়া স্টেশনে এসে থামলো। আমরা উঠে পড়লাম তাতে, এগিয়ে চলি সামনের দিকে গন্তব্য শ্রীকাকুলাম। শরীর রইলো ট্রেনের কামরায়, মন বামুনপাড়ুর সোনালী বালুকাবেলায়।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কী ভাবে যাবেন

হাওড়া-চেন্নাই মেল নৌপাড়া জংশন পৌঁছায় সকাল ১০.৪৫ নাগাদ। এছাড়া এখানে থাকে হাওড়া-হায়দরাবাদ ইস্টকোস্ট এক্সপ্রেসও, তবে তা মাঝরাতে। তাই চেন্নাই মেল ধরে আসা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। হাওড়া থেকে নৌপাড়া ৭০৫ কিমি পথ।

কোথায় থাকবেন

নৌপাড়া বা বামুনপাড়ুতে থাকবার কোনও ব্যবস্থা নেই। থাকতে হলে থাকতে হবে নৌপাড়া থেকে ৮ কিমি দূরবর্তী টেক্কালিতে। নৌপাড়া থেকে ওড়িশার নজপতি জেলার সদর শহর পারলেখামুন্ডির পথে মাত্র ৮ কিমি দূরত্বে টেক্কালি। চলে যেতে পারেন শ্রীকাকুলাম শহরে। সেখানে দেখবার রয়েছে অনেক কিছু।

পারলে দেখতে পারেন

বামুনপাড়ু থেকে টেক্কালি বা শ্রীকাকুলাম এসে গাড়ি ভাড়া করে দেখে নিতে পারেন তেলিনেল্লাপুরম পক্ষীনিবাস। মল্লিকার্জুন স্বামী মন্দির (টেক্কালি থেকে কাছে) অথবা শ্রীকাকুলামে আরসাভল্লি সূর্যমন্দির, শ্রীকুর্মানন্দ স্বামী মন্দির, কলিঙ্গপট্টনম বিচ, বংশধারা ও নাগভেলী নদী ইত্যাদি।

দূরত্ব ঃ (নৌপাড়া থেকে কিমিতে)

শ্রীকাকুলাম-৪৮, বামুনপাড়ু-১৫, টেক্কালি-৮, বিশাখাপত্তনম-১৭৭, পলাশা-২৫।

টুকরো খবর

গলছে হিমবাহ, বেরচ্ছে মৃতদেহ

বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে অস্বাভাবিক হারে, ফলে গলতে শুরু করেছে হিমবাহ, পাহাড়ের মাথায় জমে থাকা বরফের আস্তরণও উপর থেকে নিচে সরে আসছে। আর তাতেই বেরিয়ে পড়ছে মৃতদেহ।

১৯৫৩ সালে তেনজিং নোরগে আর এডমন্ড হিলারির হাত ধরেই শুরু হয়ে ছিল, বিশ্বের উচ্চতম শৃঙ্গকে কাছে পাওয়ার নেশা। অবশ্য নেশা বলা ভুল হবে, কারণ এর আগে অনেক অভিযাত্রী শৃঙ্গ জয়ের উদ্দেশ্যে পর্বতারোহন শুরু করেছিলেন, কিন্তু পৌঁছাতে পারেননি। ১৯২২ সালে, সবচেয়ে বেশি রেকর্ড মাত্রায় পর্বতারোহীদের মৃত্যু হয়েছিল।

এখন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি অনেকটাই উন্নত, তবুও এভারেস্ট এখনও অধরাই রয়ে গেছে মানুষের কাছে। এখনও পর্যন্ত অন্তত পক্ষে প্রায় দুশোজন পর্বতারোহী নিখোঁজ হয়ে গেছেন এভারেস্টে গিয়ে, মৃতের সংখ্যা প্রচুর। খরচ ও বিভিন্ন কারণেই মৃতদেহ পাহাড় থেকে নামানো সম্ভব হয়নি। বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণেই সেই মৃতদেহগুলি বরফের তলা থেকে এখন বেরিয়ে আসছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ২১০০ সালের মধ্যেই ৯৯ শতাংশ বরফ গলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে পরিস্থিতি ঠিক করতেই পরিবেশের দিকে নজর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

অবিশ্বাস্য! কলকাতা ছাড়াল যাদবপুরকে

দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দৌড়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এই তালিকা প্রকাশ করেছেন। প্রথম দশে পশ্চিমবঙ্গের দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় নিজের স্থান পাকা করে নিয়েছে। পঞ্চমে রয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আর ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। তালিকায় সবার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে যথাক্রমে আইআইএস বেঙ্গালুরু, দিল্লির জেএনইউ এবং বিএইচইউ। অষ্টমে- অমৃত বিশ্ব বিদ্যাপীঠম বিশ্ববিদ্যালয়, নবমে- মণিপল অ্যাকাডেমি অফ হায়ার এডুকেশন এবং দশমে- সাবিত্রীবাই ফুলে পুনে বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রসঙ্গত, ইউনিয়নের দাবিতে রাজ্যসরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াইতে নেমেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। যাদবপুরের বিভিন্ন বিভাগের পরিকাঠামো এবং পড়াশোনা সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের কাজ করছে ছাত্র-ছাত্রীরাই। ছাত্রছাত্রীরা এবং জুটার সদস্যরা আশাবাদী যে, খুব শীঘ্রই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সেরার তালিকায় আবার তার নিজের স্থান ফিরে পাবে।

আগুনে জ্বললো প্যারিসের নোতর দাম

সেইন নদীর ধারে অবস্থিত নোতর দামের মিনারটি প্রায় ৩০০ ফুট উঁচু এবং বানাতে সময় লেগেছিল প্রায় দু'শো বছর। সাড়ে আটশো বছরেরও বেশি পুরানো এই ধাতব মিনারটির বিপর্যয় পাল্টে দিল প্যারিসের আকাশকে। দমকলকে খবর দিলে তারা এসে এলাকা ফাঁকা করে দিলেও ওইদিন সেইন নদীর পাড়ে দাঁড়িয়েই শয়ে শয়ে মানুষ সেই ধ্বংসলীলা দেখেছিল। প্রায় ২৩ মিনিট ধরে আগুনের উৎসস্থল খুঁজে পাননি দমকল কর্মীরা। আর তারপর প্রায় ৬৩ মিনিটের মাথায় ভেঙে পরে ক্যাথেড্রালের সেই ধাতব মিনারটি আর মাত্র ঘন্টা চারেকের মধ্যেই কাঠের তৈরি গোটা ছাদটা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। প্যারিসের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাকরঁর খেদোক্তি, ''আমাদের প্রিয় নগরীর মুন্ডছেদ করেছে কেউ!''

নিজেকেই দায়িত্ব নিতে শিখতে হয়

সবাই যতই বিরোধিতা করুক না কেন, জয় তারই হবে যে লড়াইটা চালিয়ে যাবে। ভয় তো হবেই, কিন্তু ভয়কে জয় করতে পারাটাই আসল। কেউই কোনোদিন আর্থিক শক্তি বা পেশি শক্তি দিয়ে যৌক্তিকতাকে থামিয়ে রাখতে পারে না।

আমরা সবাই নেতাজীকে ভালোবাসি, মনের অন্দরমহলে তিনি আজও জীবিত, কিন্তু আমরা কতজন চাই বলুন তো আমাদের কাছের মানুষটা দেশের জন্য একাগ্রভাবেই কিছু করুক। ছেলে মেয়েকে পুলিশ বানানো পর্যন্ত মানা যায়, এর বেশি একদমই না। প্রাণ নাশের আশঙ্কা এবং বাকি বিপদের কথা ভেবেই দেশের জন্য তো নয়ই, দশের জন্যও কিছু করা হয়ে ওঠে না। এটাই ভারতবর্ষ তথা সমগ্র বিশ্বের চিত্র। কিন্তু এই কোটি কোটি জনসংখ্যার মধ্যে এখনও এমন অনেকজন আছে, যারা গায়ে কাদা লাগার ভয় না পেয়ে এগিয়ে এসেছে সমাজ সংস্কারের জন্য। এরমই একজনের কথা জানব এই প্রতিবেদনে।

ব্যাঙ্গালোরে তার জন্ম, নাম সুনিথা কৃষ্ণান। তার বাবা ছিলেন ডিপার্টমেন্ট অব সার্ভে-তে, আর সেই সুবাদেই অনেক কম বয়সেই তার বিভিন্ন দেশে ঘোরা। ছোট থেকেই সুনিথা নিজের আশেপাশে বেড়ে ওঠা তারই বয়সী বা তার থেকে ছোট শিশুদের কথা ভাবত। এই শিশুগুলো নয় সমাজের নিচু শ্রেণীর, নয় তো বা তারা প্রতিবন্ধী। সুনিথার বয়স তখন মাত্র আট, প্রতিবন্ধীদের নাচ শেখাতে শুরু করল। এটাই ছিল সমাজ সংস্করণের প্রথম ধাপ। এরপর সুনিথা সমাজের সব থেকে প্রয়োজনীয় দিকে তার নজর দিল, আর তা হল নারী শিক্ষা। মাত্র বারো বছর বয়সেই উপলব্ধি করে ছিল যে, যদি নারী শিক্ষা বিস্তার লাভ করে, তবেই সমাজের বাকি স্তরগুলো উন্নতি লাভ করবে। তাই সে নিজেই একটা স্কুল শুরু করল। যেখানে সমাজের অবহেলিত, দরিদ্র পরিবারের ছেলে এবং মেয়েরা পড়তে আসত। পনেরো বছর বয়সে সে খুব স্পষ্টতই বুঝল 'শিক্ষা', বিশেষত 'নারী শিক্ষার' বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করাটা খুবই প্রয়োজন। তাই নিজের উদ্যোগেই শিক্ষার বিস্তারের জন্য একটি ক্যাম্পেন করতে শুরু করে। কিন্তু বাধ সাধল কট্টরপন্থী পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। পুরানো রীতি মেনেই নারীর শিক্ষা অর্জন অপরাধ। সুনিথার এগিয়ে যাওয়া রুখতে, আটজন পুরুষ সমাজের নোংরা রূপটাকে দেখাল। গণধর্ষণের শিকার হল সুনিথা। শুধু তাই নয়, পনেরো বছরের সেই বাচ্চা মেয়েটির ওপর চালানো হল অকথ্য অত্যাচার। সুনিথার চিকিৎসা হল, বোঝা গেল সমাজের প্রতিবন্ধী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তাকে। চোখের দৃষ্টি কিছুটা লোপ পেলেও একটি কান পুরোটাই অকেজো হয়ে গেছে। সবাই ভেবে নিল, এটাই গল্পের ইতি।

না, সুনিথা ঘুরে দাঁড়াল, কারণ তার মেরুদন্ড এতটাও নরম নয়। পরিবেশ বিদ্যায় গ্র্যাজুয়েশনের পরে, ম্যাঙ্গালোর থেকে মেডিক্যাল ও সাইক্রিয়াটিক নিয়ে স্নাতকোত্তরের পড়াশোনা শেষ করল।

১৯৯৬ সালে ব্যাঙ্গালোরে 'মিস ওয়ার্ল্ড' নির্বাচনের অনুষ্ঠান যখন হচ্ছিল, তখন তিনি এবং বাকি সমাজ কর্মীরা প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিলেন, রূপের ভিত্তিতে কখনই একজন নারীকে বিচার করা যায় না। অন্যান্য বারের মতোই পুলিশ প্রতিবাদী সুনিথাকে গ্রেপ্তার করল। এরপর সমাজকর্মী সুনিথার জন্য বাড়ির দরজাটাও বন্ধ হল। তার ভাইয়ের সাথে হায়দ্রাবাদে 'পিপল ইনিশিয়েটিভ নেটওয়ার্ক' বলে একটি সংস্থা তিনি শুরু করলেন। সেখানেই সমাজের নিচু স্তরের মানুষদের নিয়ে কাজ করতে শুরু করেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, 'মেহেবুব কি মান্ডি' নামক একটি জায়গায় দিনে হাজার হাজার মেয়েকে বিক্রি করা হচ্ছে এবং জোর করে পতিতাবৃত্তি করানো হচ্ছে। জীবনের শেষ দশায় এই মেয়েগুলি এইডস্ রোগে আক্রান্ত এবং বিনা চিকিৎসায় রাস্তায় পড়ে মারা যাচ্ছে। তখন তিনি 'প্রজ্জ্বলা' নামে আরেকটি সংস্থা শুরু করে, সেখানে পতিতাদের সুস্থ করা, শিক্ষা দেওয়া এবং বিভিন্ন কাজের উপযোগী করে তোলার ব্যবস্থা করেন। এমনকি এই প্রজ্জ্বলাদের তৈরী বিভিন্ন জিনিস বিক্রি করার ব্যবস্থা করেছেন। শুধু এইটুকুই নয়, এখনও পর্যন্ত প্রায় বারো হাজার মেয়েকে যৌন পাচারের হাত থেকে রক্ষা করে, বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিরোধী নারী পাচার সংস্থার খেতাব পেয়েছে 'প্রজ্জ্বলা'।

সুনিথা কৃষ্ণান শুধু আমাদের অনুপ্রেরণা নয়, তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি ভয়কে জয় করতে শিখিয়েছেন। কাজ করতে গিয়ে চূড়ান্ত খারাপ মূহুর্তেও পিছনে না হেঁটে, লড়াই করতে মন্ত্র দিয়েছেন তিনি। লড়াই হতে পারে সমাজের সাথে কিংবা পরিবারের সাথে, ভয় পেয়ে থেমে গেলে চলবে না। ভয়কে জয় করাই জীবনের অন্যতম লক্ষ্য হওয়া দরকার।

সোশ্যাল মিডিয়ায় কসমেটিক জুয়েলারীর ব্যবসা

অন্যকে নতুনরূপে সাজানোর জন্য নিজের উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে তৈরি নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য্য অলঙ্কারের ছোঁয়ায় অনন্যভাবে সাজিয়ে তুলতে এক অন্য রকমের কেরিয়ারের কথা জানবো এই প্রতিবেদনে।

প্রযুক্তির অগ্রগতিতে যখন সোশ্যাল মিডিয়ার বাড়-বাড়ন্ত আশীর্বাদ না অভিশাপ, সমীক্ষা চলছে। তখন আমাদের মতই কয়েকজন সাধারণ মানুষ সোশ্যাল মিডিয়াকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে নতুন রোজগারের পথ খুলছে। সোশ্যাল মিডিয়াকে কাজে লাগিয়ে কসমেটিক জুয়েলারীর ব্যবসা চলছে রমরমিয়ে। এই প্রতিবেদন থেকে জানব, এই ব্যবসার যাবতীয় তথ্য।

মহিলাদের সাথে পাল্লা দিয়ে এখন বাকিরাও গয়নার প্রতি বেশ অনেকটাই আকৃষ্ট বোধ করে। তবে এখন বলাটা ভুল হবে, কারণ, ইতিহাসে আমরা পুরুষদের গয়নার প্রতি আকর্ষণের কথা জেনেছি। আর এখন তো যুগ বদলাছে। তাই ভারী সোনার গয়নার জায়গা নিচ্ছে হালকা কিন্তু নানান রকমের ডিজাইনের কসমেটিকের গয়না। এমনকি এই গয়নাগুলোর মধ্যে দিয়ে শিক্ষিত সমাজের হাতের ছোঁয়া পাচ্ছে অন্য ধরণের গয়নাও যেমন- পোড়ামাটি, বোহেমিয়া বিভিন্ন ধরণের গয়না। এই গয়নাগুলোকে কোনো এক জাতি বা উপজাতির গয়নার আদলে তৈরী হয়। এই সমস্ত গয়না বানানোর জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল পাওয়া যায় গড়িয়াহাট, বড়বাজারের মতো মার্কেটে। অনেকেই হয়তো জানেন না, ক্যানিং স্ট্রিটে পাইকারি দরে বানানো জিনিসপত্রও পাওয়া যায়।

এবার জেনে নেওয়া যাক এই ব্যবসায় কি কি প্রয়োজন

ডিজাইন

এই ব্যবসায় দক্ষতা অর্জন করতে হলে জানতে হবে বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন। বিভিন্ন ধরনের ডিজাইনের বই, ক্যাটালগ এমনকি অনলাইনেও দেখতে হবে।

নতুনত্ব

এক ডিজাইন সবার পছন্দ হতেই পারে, কিন্তু সেটা সব ক্ষেত্রে নয়। তাই যখনই নতুন কিছু বানাবেন। তাতে নতুনত্বের কিছু ছোঁয়া রাখুন। সব ডিজাইন এক শুধু রং আলাদা হলে কিন্তু হবে না।

দক্ষতা

কঠিন-কঠিন ডিজাইনের গয়না বানাতে গেলে দক্ষতার প্রয়োজন। বানানোর সময় কঠিন মনে হলেও, বানানোর পর ডিজাইনটা দেখতে ভালো লাগবে।

নিজস্বতা

প্রত্যেকটা গয়না যখন আপনি বানাবেন তার মধ্যে আপনার নিজের কোন না কোন ছোঁয়া রাখুন। যা ভবিষ্যতে আপনার তৈরী গয়নার পরিচয় সৃষ্টি করবে। এক কথায় বলা যেতে পারে, আপনার গয়নার ব্র্যান্ডকে সবাইকে একেবারে চিনে নিতে সাহায্য করবে।

ধৈর্য

ডিজাইন কঠিন হতে পারে, কাস্টমার পেতে দেরি হতে পারে, তাই বলে ধৈর্য হারালে চলবে না।

সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার -

প্রথমত, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী হতে হবে। তাহলেই সোশ্যাল মিডিয়ার সমস্ত বৈশিষ্ট্য এমনকি খারাপ দিকগুলোও জানা থাকবে।

দ্বিতীয়ত, সোশ্যাল মিডিয়াতে নিজের গয়নার কোম্পানি বা দোকানের নামে একটা পেজ খুলতে হবে। সেখান থেকেই অনলাইনে গয়নার ছবি তুলে তা দাম সহ পোস্ট করতে হবে।

তৃতীয়ত, যখন কেউ আপনার গয়না কিনতে চাইবে তখন তাকে মেসেজের মাধ্যম দিয়ে গয়নার বুকিং করাটা সহজ হবে। প্রথমেই ফোন বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর দিলে তাতে অন্য সমস্যা হতে পারে।

চতুর্থত, আপনার সুবিধা এবং বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর নির্ভর করে আপনিই ঠিক করুন, আপনি টাকা অনলাইন পেমেন্ট না ক্যাশ অন ডেলিভারি করবেন।

পঞ্চমত, ছবির সাথে গয়নার যেন আকাশ-পাতাল পার্থক্য না থাকে, তাহলে আপনার গয়না খরিদ্দারের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবে।

ষষ্ঠত, কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানে, বিশেষ কালেকশনের লিমিটেড অফারের জন্য গয়না বানান। যেমন - পুজো স্পেশাল বা নববর্ষ স্পেশাল। গয়নার ডিজাইন যেন এই স্পেশাল জিনিসগুলোর সাথে মেলে এমন কিছুকে তুলে ধরা হয়। আর দামটা কিছুদিনের জন্য কম করে দেবেন।

এইভাবেই সোশ্যাল মিডিয়াকে কাজে লাগাতে পারেন। এছাড়াও নিজের একটা ওয়েবসাইট বানিয়ে সেখান থেকেই নিজের গয়নার ব্র্যান্ডকে সবার সামনে তুলে ধরুন।

হাসি ও কান্না কোনটাই চেপে রাখা ঠিক নয়

হাসি ও কান্না কোনটাই চেপে রাখা ঠিক নয়। আমাদের মস্তিষ্কের প্রায় একই জায়গা থেকেই কান্না ও হাসি দু'টিরই অনুভূতি আসে। হাসি যেমন রক্তচাপ কমায়, শরীরকে তরতাজা রাখে, কান্নাও ঠিক তাই করে।

প্রামন খুব খারাপ? সোজা খোলা একটি মাঠে চলে যান। প্রাণ খুলে এক পশলা কেঁদে নিন। কী, খেলার মাঠ নেই? তাহলে বাথরুমে ঢুকে পড়ুন, শাওয়ার ছেড়ে ইচ্ছে মতো কেঁদে নিন কিছুক্ষণ। মন হালকা হয়ে যাবে, একশোভাগ গ্যারান্টি। ভুলেও এই কান্না চেপে রাখবেন না যেন। হাসির বিষয়টিও না। ভীষণ আনন্দের উপলক্ষ এসেছে, অথচ পাশেই রাশভারি কোনও মুরব্বি। মন খুলে হাসতে পারছেন না। এটা কিন্তু ঠিক না। জীবনে হাসি আর কান্না কোনওটাই চেপে রাখা ঠিক নয়। শুনতে একটু অদ্ভুত লাগলেও একথা সত্যি যে, আমাদের মস্তিষ্কের প্রায় একই জায়গা থেকেই কান্না ও হাসি দু'টিরই অনুভূতি আসে। হাসি যেমন রক্তচাপ কমায়, শরীরকে তরতাজা রাখে, কান্নাও ঠিক তাই করে। নিউরো-সাইকোলজিস্টরা সম্প্রতি গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, কান্না মানসিক চাপ কমায়। গবেষণায় দেখা গেছে যে, ৮৫ ভাগ নারী ও ৭৩ ভাগ পুরুষ কান্নার পর ভাল বোধ করেছেন, তাঁদের মানসিক চাপ কমে যাচ্ছে। শুধু শারীরিকভাবে ভাল বোধ করাই নয়, কান্নার ফলে কিন্তু পরিবেশ বদলে যায়, তা খেয়াল করেছেন নিশ্চয়ই। আশেপাশের রাগত স্বভাবের লোকজন আর গরম পরিবেশ কিন্তু বদলে যাচ্ছে নিমেষেই। লোকজন আপনার প্রতি সহানুভূতিশীল হচ্ছে আর আপনার বন্ধু আপনার দিকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে।

অনেক সময় আমরা বুঝতেই পারি না যে, আমাদের মন খারাপ হয়ে আছে, বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। হঠাৎ হয়তো কেঁদে ফেলার পর তা প্রকাশ পায়। নিজের মনের অনুভূতি তখন বুঝতে পারি নিজেই। মনের দুঃখের অনুভূতি প্রকাশ না থাকা অর্থাৎ না কেঁদে থাকা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই খারাপ ব্যাপার। গবেষণায় দেখা গেছে, এতে করে রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে, শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে যেতে পারেন, কর্মক্ষমতা কমে যেতে পারে, দুঃখিত হয়েও কান্না না করাটা ডিপ্রেশন বা বিষন্নতার একটি প্রধান লক্ষণ। আমরা কতটা কাঁদতে পারি তা ঠিক করে আপনার জিন। আবার নারী-পুরুষের মাঝেও কিছু ভিন্নতা আছে। পুরুষের তুলনায় নারী চারগুণ বেশি কাঁদে। তবে কান্নার পরিমাণটা এখানে আলোচ্য বিষয় নয়।

কান্না পেলে কান্নাটাই ভাল। কাঁদলে মন হালকা হয়, সেই পুরনো কথাই আবার প্রমাণ করলেন নিউরো- সাইকোলজিস্টরা। সুস্বাস্থ্যের জন্য, মানসিক চাপ পরিহার করতে, কর্মদক্ষতা বাড়াতে তাই হাসির পাশাপাশি প্রয়োজনে কান্নাকাটিও দরকার আছে বইকি। কান্না পেলে কাঁদবেন, কারও সামনে না হোক অন্তত আড়ালে।

একদল গবেষক ডাক্তারের গবেষণায় উঠে এসেছে, আমাদের মস্তিষ্কের প্রায় একই জায়গা থেকে কান্না ও হাসির অনুভূতি আসে। হাসি যে ভাবে রক্তচাপ কমায়, শরীরকে ঝরঝরে ও তরতাজা রাখে, কান্নাও তাই করে। নিউরো-সাইকোলজিস্টদের সাম্প্রতিক গবেষণায় গেছে, কান্না মানসিক চাপ কমায়। তাঁরা আরও দেখেছেন, প্রচন্ড দুঃখে না কাঁদা স্বাস্থ্যের জন্য খারাপ ফল বয়ে এনেছে। হাসার ব্যাপারে অবশ্য সহযোগী পাবেন হাটে-মাঠে-ঘাটে। কিন্তু কান্নার জন্য কাউকে পাশে পাবেন না। মানুষকে কাঁদতে হয় একা একা। হ্যাঁ, আড্ডায় হাসাহাসি হয়, আনন্দ ভাগাভাগি হয়। কিন্তু, কান্না কি ভাগাভাগি হয় কখনও? না। এ কারণে ঘাবড়ে যাওয়ার দরকার নেই। ওই যে খোলা মাঠ কিংবা বাথরুম পদ্ধতি। যে কোনওটা অনুসরণ করুন। কারণ, জীবন তো আপনারই। তাকে সাজিয়ে তুলতে হবে আপনাকে নিজেকেই।

১৫৮তম জন্মবার্ষিকিতে বিনম্রচিত্তে স্মরণ করি বিশ্বকবিকে

“তখন আমায় নাইবা মনে রাখলে, তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাইবা আমায় ডাকলে।...”

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কোনো না কোনো ভাবে জড়িয়ে আছেন নোবেল জয়ী বিশ্ব বিখ্যাত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্দেশ্যে শরৎচন্দ্র বলেছেন, ‘‘কবিগুরু তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই’’। কবির প্রতিভা গোটা বিশ্বের কাছে এক পরম বিস্ময়। তিনি কোনো মহাপুরুষ ছিলেন না তবে তাঁর উপলব্ধিতে মহাপুরুষদের অনুভূতি উপলব্ধ হয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই ছিলেন প্রথম ভারতীয় যিনি নোবেল পুরষ্কার (১৯১৩) পান।

১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ (৭ই মে, ১৮৬১) জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি আমাদের সকলের কাছে কখনো গুরুদেব কখনো-বা কবিগুরু কখনো-বা বিশ্বকবি আবার কখনো প্রাণের ঠাকুর নামেও পরিচিত। শৈশবের কিছুদিন তিনি কলকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারি নর্ম্যাল স্কুলে, বেঙ্গল অ্যাকাডেমি এবং তারপরে জেভিয়ার্স কলেজিয়েট স্কুলে কিছুদিন পড়াশোনা করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ শিক্ষায় আগ্রহ না থাকায় পরবর্তীকালে বাড়িতেই গৃহশিক্ষকের কাছে চলতে থাকে তার পড়াশোনা। ১৮৭৮ সালে ব্যারিস্টারি পড়ার উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডে যান তিনি। প্রথমে তিনি ব্রাইটনের একটি পাবলিক স্কুলে ভর্তি হন, তারপর আইনবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনার জন্য ১৮৭৯ সালে ইউনিভারসিটি কলেজ অব লন্ডন-এ ভর্তি হন। সাহিত্যচর্চায় আগ্রহ থাকার জন্য তিনি তাঁর পড়াশোনা সম্পূর্ণ না করেই ১৮৮০ সালে প্রায় দেড় বছর পর কোনো ডিগ্রি না নিয়েই দেশে ফিরে আসেন তিনি। তবে ইংল্যান্ডে থাকাকালীন শেক্সপিয়ার ও অন্যান্য ইংরেজ সাহিত্যকদের রচনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। দেশে ফিরেই তিনি সাহিত্যচর্চায় মনোযোগী হয়ে ওঠেন। ১৮৮৭ সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সে ‘ভানুসিংহ’ (ভানু সিংহ ঠাকুর) ছদ্মনামে তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। তিনি ১৮৮৩ থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যে মোট ১২টি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - চোখের বালি, ঘরে বাইরে, চতুরঙ্গ, গোরা, চার অধ্যায়, শেষের কবিতা, বউ ঠাকুরাণীর হাট ইত্যাদি। এরপর একে একে

প্রভাতসংগীত, সন্ধ্যাসংগীত, গান, কবিতা যেমন - সোনার তরী, চিত্রা, খেয়া, বলাকা, পলাতক, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি, শেষ সপ্তক, পত্রপুট, শ্যামলী ইত্যাদি প্রকাশ পায়। এছাড়াও তিনি অসংখ্য ছোটো গল্প (কাবুলিওয়ালা, ক্ষুধিত পাষাণ, পোস্টমাস্টার, দেনাপাওনা, গুপ্তধন ইত্যাদি), প্রবন্ধ-সাহিত্য (সাহিত্যের পথে, প্রাচীন সাহিত্য, সাহিত্যের স্বরূপ, আধুনিক সাহিত্য, লোকসাহিত্য, সংগীতচিন্তা ইত্যাদি), নাটক (অচলায়তন, তাসের দেশ, গুরু, ডাকঘর ইত্যাদি), গান (জন-গন-মন, ও আমার দেশের মাটি, আমারও পরাণও যাহা চায়, পাগলা হাওয়া ইত্যাদি) রচনা করে গেছেন। কবির রচনায় ফুটে উঠেছে কখনো মানবহৃদয়ের বিষণ্ণতা, মানবপ্রেম বা প্রেম বা সৌন্দর্য সম্পর্কিত রোম্যান্টিক ভাবনা কিংবা তাঁর আধ্যাত্মিক চিন্তা আবার কয়েকটি কাব্যগ্রন্থে তিনি নারীজীবনের সমসাময়িক সমস্যাগুলিও তুলে ধরেছেন। জীবনের শেষ দশকে লেখা রোগশয্যায়, আরোগ্য, জন্মদিনে ও শেষ লেখা কাব্যে মৃত্যু ও মর্ত্যপ্রীতিকে একটি নতুন আঙ্গিকে পরিস্ফুট করেছেন। তাঁর রচিত সর্বশেষ কবিতা ‘‘তোমার সৃষ্টির পথ’’ মৃত্যুর আট দিন আগে মৌখিকভাবে রচনা করেন। পরিণত জীবনে তিনি মনোযোগী হয়েছিলেন চিত্রশিল্পে। ৬০ বছর বয়সে তিনি চিত্রাঙ্কণ শুরু করেন। চিত্রকলায় তাঁর কোনো প্রথাগত বা আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ছিল না। খেলার ছলেই তিনি আঁকতে শুরু করেছিলেন এবং পরে তা নেশায় পরিণত হয়। তাঁর আঁকা অজস্র ছবি রয়েছে যা তাঁরই অঙ্কণ প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। সেই সময় বাংলার শিক্ষিত পরিবারে নৃত্য চর্চা নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও সংগীত ও চিত্রকলার সাথে সাথে নৃত্যকেও তিনি বিশ্বভারতীর পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকনৃত্য ও ধ্রুপদি নৃত্যশৈলীগুলির সংমিশ্রণে তিনি এক নতুন শৈলীর প্রবর্তন করেন যা ‘রবীন্দ্রনৃত্য’ নামে পরিচিত।

সকলের মাঝে কবির অনুপস্থিতির প্রায় ৭৭ বছর (৭ই আগস্ট, ১৯৪১) অতিক্রান্ত। তাঁর অমর সৃষ্টিকর্মের মধ্যে দিয়ে তিনি প্রতিনিয়ত আমাদের পাশে রয়েছেন, ও অনন্ত কাল ধরে থাকবেন আমাদের হৃদয়ে। প্রতি বছর তাঁর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নানাভাবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার উদ্যোগ-আয়োজন চলে। রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী শুধুমাত্র কবিকে স্মরণ করার অবকাশ নয়, বর্তমান সাহিত্যের গতিপ্রকৃতির মূল্য নির্ধারণ করার সময়।

অ্যালার্জিতে হোমিওপ্যাথি

খাদ্য অ্যালার্জি, কীট-পতঙ্গ অ্যালার্জি, ড্রাগ অ্যালার্জি, ধূলোবালি থেকে অ্যালার্জি, ল্যাটেক্স অ্যালার্জি, পোষ্য অ্যালার্জি ইত্যাদি নানান ধরণের অ্যালার্জি থেকে মুক্তি পেতে হোমিওপ্যাথির আশ্রয় নিন।

অনেক সময়ই আমরা নানান ধরণের শারীরিক সমস্যায় ভুগে থাকি। আর এই সকল সমস্যার মধ্যে অন্যতম হল অ্যালার্জি। আমরা সকলেই প্রায় কমবেশি কোনো না কোনো অ্যালার্জিতে ভুগে থাকি। অ্যালার্জি নানান ধরণের হয়ে থাকে যেমন, খাবার থেকে অ্যালার্জি বা খাদ্য অ্যালার্জি, কীট-পতঙ্গ অ্যালার্জি, ধূলোবালি থেকে অ্যালার্জি, ড্রাগ অ্যালার্জি, ল্যাটেক্স অ্যালার্জি, পশুপাখি থেকে অ্যালার্জি বা পোষ্য অ্যালার্জি ইত্যাদি। এই সকল নানান প্রকার অ্যালার্জির লক্ষণও আবার আলাদা হয়। যেমন, খাবার থেকে অ্যালার্জি বা খাদ্য অ্যালার্জির ক্ষেত্রে লক্ষণগুলি ভিন্ন প্রকৃতির হয়, কারো চিংড়ি বা ইলিশ মাছে অ্যালার্জি, কারো আবার বেগুনে অ্যালার্জি, আবার কারো ডিম বা মুরগির মাংসে অ্যালার্জি। অ্যালার্জিতে কারো হয়তো গায়ে র‍্যাশ বের হয় কিংবা কারো শুধুই গা-হাত-পা চুলকায়। অনেকের আবার ধূলোবালি থেকেও অ্যালার্জি আছে, সেক্ষেত্রে কারো হয়তো বারবার হাঁচি হয় আবার কারও হয়তো শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। খেয়াল করলে দেখা যায়, আমাদের মধ্যে প্রায় অনেকেরই বাড়িতে কোনো না কোনো প্রজাতির কুকুর কিংবা বিড়াল অথবা পাখি আছে। কেউ হয়তো

পশুপাখি ভালোবাসেন আবার কেউবা সখ করেই রাখে তাদেরকে। অ্যালার্জি হতে পারে পশুপাখি থেকেও। শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি। এই নিরীহ, অবলা পশুপাখির থেকেও হতে পারে অ্যালার্জি যা এক-কথায় পোষ্য বা পেট অ্যালার্জি নামে পরিচিত। এই নানান প্রকার অ্যালার্জি থেকে মুক্তির জন্য বাজারে নানান প্রচলিত অ্যালোপ্যাথি ওষুধ থাকলেও তার পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াও থাকে। সেই তুলনায় হোমিওপ্যাথির পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া নেই বললেই চলে। বাজারে অতি প্রয়োজনীয় ও অতি পরিচিত কিছু হোমিওপ্যাথি ওষুধ আছে যা খুবই সাধারণ কিছু উপসর্গের ভিত্তিতে পাওয়া যায়। **এইবার দেখে নেওয়া যাক অ্যালার্জিতে কার্যকরী কিছু ওষুধের নামঃ**

কার্বোভেজ ৩০, নাক্সভোমিকা ৩০ এবং সালফার ২০০ ঃ

কার্বোভেজ, নাক্সভোমিকা এবং সালফার ডিম থেকে অ্যালার্জির জন্য শীর্ষ প্রতিকার দেয়। কার্বোভেজ এবং নাক্সভোমিকা ডিম অ্যালার্জির জন্য নির্ধারিত হয় যেখানে গ্যাসট্রিকের লক্ষণগুলি সব থেকে বেশি। বমি বমি ভাব, গ্যাস এই ধরণের উপসর্গ দেখা গেলে কার্বোভেজ ৩০ খাওয়া যেতে পারে। আর যদি এই লক্ষণগুলির সাথে পেটে ব্যথাও হয় সেক্ষেত্রে নাক্সভোমিকা উপকারি ওষুধ। কিন্তু যদি এই উপসর্গগুলির সাথে গ্যাসট্রিকের সমস্যার সাথে সাথে র‍্যাশ ও ত্বকে জ্বালা অনুভূত হয়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে সালফার হল সবচেয়ে কার্যকরী ওষুধ।

স্যাবিলা, আর্সেনিক অ্যালবাম

ধূলোবালি নাকে ঢুকে অনেকেরই শ্বাসকষ্ট, হাঁচি এই ধরণের উপসর্গগুলি দেখা গেলে স্যাবিলা উপকারী ওষুধ। আর যদি এই উপসর্গগুলি ছাড়াও নাক দিয়ে জল পড়া, নাক লাল হয়ে ফুলে যাওয়া ইত্যাদি দেখা যায়, সেই ক্ষেত্রে আর্সেনিক অ্যালবাম খুবই কার্যকরী ওষুধ।

সালফার

ত্বক শুষ্ক ও খসখসে হয়ে গিয়ে র‍্যাশ বা চুলকানি,

কিংবা সাদা দাগ বা কালো ছোপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সালফার খুবই উপকারি এবং বেদনা উপশমকারী ও আরামদায়ক ওষুধ।

ওয়াইথিয়া হিলনোনিডস

গায়ক বা পাবলিক স্পিকারদের প্রায়শই গলা ভেঙে যাওয়া বা গলা বসে যাওয়ার মতো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এইক্ষেত্রে সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রতিকার হলো ওয়াইথিলা হিলনোনিডস যা আবার ওয়াইথিলা নামেও পরিচিত।

অ্যালিয়াম সিপা

নাকের নিচ এবং ঠোঁটের উপরের ত্বক শুষ্ক ও খসখসে হয়ে যদি ফুলে ওঠে ও লাল হয়ে যায় তবে অ্যালিয়াম সিপা হলো এক্ষেত্রে যথাযথ ওষুধ।

অ্যালার্জিতে আক্রান্ত প্রতিটি রোগীরই প্রায় কমবেশি অস্বস্তির সাথে সাথে সবসময়ই একই রকম লক্ষণ দেখা যায় না। রোগীর লক্ষণ অনুসারে এক একজনের ক্ষেত্রে এক একটা আলাদা আলাদা ওষুধ প্রয়োজন হয়। তাই অ্যালার্জির কোনো লক্ষণ দেখা গেলে দেরি না করে অতি অবশ্যই কোনো অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে ভুলবেন না।

মুঠো মুঠো অ্যান্টাসিড নয়, ঘরোয়া টোটকায় গ্যাসের ব্যাথার উপশম

গ্যাসের যন্ত্রণা কার নেই, প্রায় প্রত্যেকেই এই সমস্যায় ভুগছেন। এরথেকে রেহাই পেতে খেয়ে যাচ্ছেন গাদাগাদা অ্যান্টাসিড। কিন্তু ঘরোয়া কিছু উপায় রয়েছে, যেগুলো প্রয়োগ করলে এ সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে।

গ্যাসের যন্ত্রণায় যাঁরা ভোগেন তাঁরাই ভাল জানেন কতটা অস্বস্তিকর। একটু ভাজাপোড়া অথবা পার্টিতে মশলাযুক্ত খাবার খেলে তো শুরু হয়ে যায় অস্বস্তিকর গ্যাসের সমস্যা। ফাস্টফুড, ব্যস্ত জীবনযাত্রার যুগে গ্যাস, পেটের অসুখ এখন ঘরোয়া।

কারও ঘরে গেলে আর যাই হোক গ্যাসট্রিকের ওষুধ অবশ্যই পাওয়া যায়। তবে কি গাদাগাদা গ্যাসের ওষুধে এই সমস্যা দূর হয়! কিন্তু ঘরোয়া কিছু উপায় আছে, যেগুলো প্রয়োগ করলে গ্যাস, বুক জ্বালা থেকে সহজেই বাঁচা যায়। জেনে নেওয়া যাক

শশা

শশা পেট ঠান্ডা রাখতে অনেক বেশি কার্যকরী খাদ্য। এতে রয়েছে ফ্লেভানয়েড ও অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান, যা পেটে গ্যাসের উদ্রেক কমায়।

দই

দই হজমশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এতে দ্রুত খাবার হজম হয়। ফলে পেটে গ্যাস হওয়ার ঝামেলা দূর হয়।

পেঁপে

পেঁপেতে রয়েছে পাপায়া নামক এনজাইম, যা হজম শক্তি বাড়ায়। নিয়মিত পেঁপে খাওয়ার অভ্যাস করলেও গ্যাসের সমস্যা কমে।

কলা ও কমলা

কলা ও কমলা পাকস্থলির অতিরিক্ত সোডিয়াম দূর করতে সহায়তা করে। ফলে গ্যাসের সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এছাড়া সলুবল ফাইবারের কারণে কলা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করার ক্ষমতা রাখে। সারাদিনে অন্তত দু'টি কলা খান। পেট পরিষ্কার রাখতে কলার জুড়ি মেলা ভার।

আদা

আদা সব চাইতে কার্যকারী অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান সমৃদ্ধ খাবার। পেট ফাঁপা এবং পেটে গ্যাস হলে আদা কুচি করে লবণ দিয়ে কাঁচা খান, গ্যাসের সমস্যার সমাদান হবে।

ঠান্ডা দুধ

পাকস্থলির গ্যাসট্রিক অ্যাসিডকে নিয়ন্ত্রণ করে অ্যাসিডিটি থেকে মুক্তি দেয় ঠান্ডা দুধ। এক গ্লাস ঠান্ডা দুধ পান করলে অ্যাসিডিটি দূরে থাকে।

দারুচিনি

হজমের জন্য খুবই ভাল। এক গ্লাস জলে আধ চামচ দারুচিনির গুঁড়ো দিয়ে ফুটিয়ে দিলে ২-৩ বার খেলে গ্যাস দূরে থাকবে।

জিরা

জিরা পেটের গ্যাস, বমি, পেটখারাপ, রক্ত বিকার প্রভৃতিতে অত্যন্ত ফলপ্রদ। জ্বর হলে ৫০ গ্রাম জিরা আখের গুড়ের মধ্যে ভালভাবে মিশিয়ে ১০ গ্রাম করে পাঁচটি বড়ি তৈরি করুন। দিনে তিনবার একটি করে বড়ি খেলে ঘাম দিয়ে জ্বর সেরে যাবে।

লবঙ্গ ঃ

২-৩টি লবঙ্গ মুখে দিয়ে চুষলে একদিকে বুক জ্বালা, বমিবমি ভাব, গ্যাস দূর হয়। সঙ্গে মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়।

এলাচ ঃ

লবঙ্গের মতো এলাচ গুঁড়ো খেলে অম্বল দূরে থাকে।

পুদিনা পাতার জল ঃ

এককাপ জলে ৫টা পুদিনা পাতা দিয়ে ফুটিয়ে খান। পেট ফাঁপা, বমিবমি ভাব দূরে রাখতে এর কোনও বিকল্প নেই।

মৌরির জল ঃ

মৌরি ভিজিয়ে সেই জল খেলে গ্যাস থাকে না।

খাবারে সর্ষে যোগ করুন ঃ

সর্ষে গ্যাস সারাতে সাহায্য করে। বিভিন্ন খাবারের সঙ্গে সর্ষে যোগ করা হয়, যাতে সেসব খাবার পেটে গ্যাস সৃষ্টি করতে না পারে। নজর রাখতে হবে নিজের খাওয়া-দাওয়ার প্রতি। জেনে নিতে হবে কোনটি খাওয়া উচিত হবে, কোনটি না।

Madhurima PRINTERS

House of Complete Printing Solutions

All Kinds of Commercial Designing & Printing

FLEX • DIGITAL • OFFSET • T-SHIRT • MUG PRINT

17 Pataldanga Street, Kolkata-700009

Ph.: 87776 21552 / 91430 75675

E: madhurimaprinters@gmail.com

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বিহেভিয়ারাল সায়েন্স-এর পক্ষে ডা. কেদার রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা পি-৭ সি আই টি রোড, মৌলালি, কলকাতা-৭০০০১৪ থেকে 'অ্যাঞ্জেল' প্রকাশিত ও মুদ্রিত ● মধুরিমা প্রিন্টার্স থেকে মুদ্রিত ● ফোনঃ ২২৮৬-৭০৩৮, E-mail: angelpublishers@gmail.com ● **সম্পাদক ঃ কেদার রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়** ● RNI No. WBBEN/2009/34317